খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) এর সাধনা-জীবনে প্রকৃতি, পাহাড় ও সমুদ্রের প্রভাব

গোলাম ফারুক হামিম এবং আফরোজা বুলবুল

স্রষ্টা এবং সৃষ্টি। এর বাইরে কিছু নেই এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে স্রষ্টা নিজেই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব। স্রষ্টার অসীমত্ব আমাদের কল্পনার উর্দ্ধে এবং তাঁর সৃষ্টিজগত অসীম না হলেও সমগ্র সৃষ্টির যৎসামান্যই আমাদের গোচরীভূত। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা বুঝি সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে দুটো বিষয়, জীব ও জড়। কিন্তু নিগূঢ় চিন্তা, সৃষ্টিতত্ব গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষুদ্রতম জড় পরমাণুও বিশাল শক্তির আধার এবং পদার্থ মাত্রই পারস্পরিক আকর্ষণের জালে যুক্ত।

মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র:) তাঁর জীবনে বৈচিত্র্যময় সমস্ত সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেননি। স্রষ্টার সকল সৃষ্ট বস্তুকে তিনি একই পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং সৃষ্টির পরতে পরতে তিনি মহাপ্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করতেন। একই সঙ্গে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেম, জড় ও জীবের প্রেম, মানবের সাথে মানবের প্রেম, মানবের সাথে প্রকৃতির প্রেম সব কিছুতে তিনি প্রেমময়ের মহিমার গভীরতা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি যাকে বলেছেন 'মহব্বত' এবং এই মহব্বতকেই তিনি জীবনের মূল বিষয় জ্ঞান করে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

স্রষ্টা, প্রকৃতি ও মানুষ এই তিন এর মধ্যে এক অভূতপূর্ব সংযোগ আবিষ্কার করেছিলেন খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র:)। তাঁর মতে সৃষ্টির মূলে প্রেম। তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি তাই বলেছেন "বিশ্বের প্রতি অনু-পরমাণু বিরাট প্রেমের পরিচায়ক। প্রত্যেক বস্তু প্রেমেরই উদ্ভব। এই প্রেম প্রত্যেক পদার্থের অনু-পরমানুকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, যাহা সংসক্তি নামে পরিচিত। মাধ্যাকর্ষণ ভূ-মন্ডলসহ সমগ্র পদার্থকে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমূখে আকর্ষণ করে, তাহাও সেই বিশ্ব প্রেমের পরিচায়ক। মহাকর্ষণ, যদ্বারা সমগ্র গ্রহ উপগ্রহ স্ব স্ব সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একই নিয়মে আবর্তন করে। তাহাও সেই বিশ্ব প্রেমের পরিচায়ক" (পৃষ্ঠা-১৮)।

আকাশ, বাতাস, ঝর্ণা, সমুদ্র, নদী, চাঁদ, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিদরাজি, জীব জন্তু, কীট-পতঙ্গ, ক্ষুদ্র বালুকনা থেকে শুরু করে অসংখ্য সৃষ্টির সমন্বয়ই আমাদের এ প্রিয় প্রকৃতি। একজন কর্মব্যস্ত শিক্ষা-প্রশাসক হয়েও হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র:) সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন স্রষ্টার অকৃপণ নিপুণতা ও সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অনন্ত ভালাবাসা। তিনি শুধু বাহ্য নয়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেকার সুসজ্জা, বিন্যাস ও সমন্বয়। ফলশ্রুতিতে স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং সেই সাথে সৃষ্টিজগত তথা মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি অগাধ প্রেম ও ভালোবাসাই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের সাধনা। খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র:) এর জীবন ও দর্শনে প্রকৃতির বিশেষ করে পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের প্রভাব তাই প্রখর উজ্জলতায় দীপ্যমান এবং এ বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা, বিশ্লেষণ করাই আজকের গবেষণার/প্রবন্ধের মূল বিষয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থ বিশেষ করে আমার জীবন ধারা, হেজাজ ভ্রমণ ও ভক্তের পত্রের প্রতি ছত্রে ছত্রে তিনি লিখে গিয়েছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিগূঢ় সম্পর্কের নানান দিক। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন সতত খুঁজে বেড়িয়েছে স্রষ্টার নানাবিধ সৃষ্টি-রহস্যকে। ক্ষুদ্র বালুকা, নব বিকশিত পত্র পল্লবী, ছোট্ট পাখির কূজন সব কিছুতেই তিনি দেখেছেন স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর শৈল্পিকতা ও অসীমতা। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পুলকিত হয়ে তিনি হয়েছেন বিস্মিত, পরম ভক্তিতে করেছেন মাথানত। জ্বরা, বিষাদ ও পীড়ায় তিনি বারংবার ছুটে গিয়েছেন প্রকৃতির কাছে, ভুলেছেন ক্লান্তি, পেয়েছেন স্বস্থি ও প্রেরণা।

কখনো ভরা পুর্ণিমায়, কখনো ঘোর অমাবষ্যায়, স্নিগ্ধ ভোরে, ঝড়ের রাতে, গোধূলীর মায়াবিক্ষণে, গভীর রজনীতে, তাপদাহ দুপুরে তিনি অবলোকন করেছেন সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে স্রষ্টার অপার কৃপা এবং অস্তিত্ব। আবেগ মথিত হয়ে বলেছেন "নানা কাজের মাঝে মনকে নিয়োজিত রাখিতে চেষ্টা করি, তবু প্রতি মুহূর্ত্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি। সেই পর্ব্বতমালা, সেই রজত-নিন্দিত শুভ্র আকাশ, সেই নিথর নিস্তব্ধতা, সেই নির্মল প্রিয়জন সঙ্গ, আর প্রকৃতির সেই অপ্রমেয় সৌন্দর্য্য হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এখানকার কৃত্রিমতার মধ্যে সে লালিত্য, সে নির্ম্মলতা, সে

পবিত্রতা অনুভূত হয়না । ইচ্ছা হয় দৌড়িয়া পলায়ন করি, কৃত্রিমতা হইতে বিদায় লই" (ভক্তের পত্র, পত্র সংখ্যা ২০)। প্রকৃতিকে তিনি যতই দেখেছেন ততই প্রকৃতিকে জানার তৃষ্ণা তাঁকে করেছে চির অনুসন্ধিৎসু, বানিয়েছে প্রেমিক, শিখিয়েছে ক্ষুদ্রতা পরিহার করে প্রকৃতির মতোই চরম ঔদার্য্যে সকলকে আত্মস্থ করে এগিয়ে যেতে।

কর্মসূত্রে তিনি নগর জীবনে ব্যস্ত সময় কাটালেও নির্জনতায় তিনি হারিয়ে যেতেন অনেক বেশী। নিঃসর্গের নিরবতায় তিনি খুঁজে পেতেন মহাপ্রভুকে, সাড়া পেতেন তাঁর অস্তিত্বের। তাঁর ভাবাবেগের এরূপ বহিঃপ্রকাশ ভক্তের পত্র গ্রন্থের ৩৯ নং পত্রেও রয়েছে, সেখানে তিনি বলেছেন, "রাত্রিকালে নদীবক্ষে নিঃসঙ্গ চিন্তা কত মধুর, একটু দৃষ্টি করিলে হৃদয়ের অন্তস্থলে কত রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহারা কেবল অনুভবের জিনিষ, ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না। কলিকাতার কৃত্রিমতার মধ্যে এ নিস্তব্ধতা কোথায় ? এখানে চঞ্চলা প্রকৃতি যেন নৃত্য করিতেছে । চারিদিকে পবিত্রতার ছটা বিকীর্ণ। সর্ব্বত্র কেবল গভীর প্রসন্নতা বিরাজমান। নগরের দৃশ্যে চক্ষু ঝালা-পালা হইয়া যায়, আর এখানকার দৃশ্যে অন্তরাত্মা শান্তি লাভ করে। এখানে মায়া নাই, কুহক নাই, আছে কেবল সত্য, প্রেম আর পবিত্রতা । দেহের বিলাস-ভূমি কৃত্রিম শহর, আর আত্মার লীলাক্ষেত্র এই বিমল প্রকৃতি।"

নগরের কোলাহল ও পার্থিব জীবনের কৃত্রিমতা থেকে তিনি বারংবার ছুটে যেতে চেয়েছেন প্রকৃতির কাছে। নাগরিক কৃত্রিমতা ও তপ্ত নি:শ্বাসে তার ক্লিষ্ট মন ও শরীর নিস্পাপ জগতের শুদ্ধ বায়ু ও নির্মল পরিবেশে আশ্রয় খুঁজে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বারবার। প্রকৃতির পূর্ণ প্রকল্পে, গাম্ভীর্য্যে ও নিরবতায় তিনি তার আত্মার পরিশুদ্ধি ও প্রসারণ করতে চেয়েছেন এবং বলেছেন, "আমাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও, যে দেশে ক্রোধ-হিংসা-গরিমা নাই, সেই দেশে থাকিতে দাও। প্রকৃতির অনন্ত স্রোতে মিলিয়া যাইতে দাও" (ভক্তের পত্র,পৃষ্ঠা-২৬) ।

প্রকৃতি প্রেমিক এই মহান পুরুষের সমস্ত জীবন-জুড়ে সকল স্তরে স্তরে রয়েছে প্রকৃতির উজ্জ্বল প্রভাব, যা তাঁকে সৃজনশীল হতে সহায়তা করেছে, করেছে পরম সত্যেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে, সংসারের যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির বন্ধনায় ডুবে যেতে পারঙ্গম। এভাবে প্রকৃতির শোভামণ্ডিত স্থানগুলোর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রয়েছে তাঁর চট্রগাম, দার্জিলিং, কলিকাতার গঙ্গাতীর, নদীবক্ষ, বঙ্গোপোসাগর, ময়নামতি, বাড়বকুণ্ড, কক্সবাজার, টেকনাফ, বান্দরবান সহ বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণের স্মৃতিকথায়।

তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধি প্রকৃতির অলিন্দে অমাবষ্যার ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আবিস্কার করেছে জ্যোতি। যাকে তিনি বলেছেন, ' অন্ধকারের জ্যোতি' বা illuminating darkness। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁকে করেছে আবেগ তাড়িত, মুগ্ধ এবং বিস্মিত। তিনি সবাইকে আহ্বান করেছেন সে সৌন্দর্য্যে অবগাহন করতে। কাঁদী সমুদ্রতীরে মধ্যরজনীতে লেখা এক পত্রে তিনি লিখলেন' "কৃত্রিমতা এখানে জাল বিস্তার করিতে পারে নাই। এই স্থানে পুন্যতা প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, এখানকার অমাবষ্যা শহরের পূর্ণিমা হইতেও জতির্ম্ময়ী; সৌন্দর্য, মাধুর্য্য, পবিত্রতা সমস্ত প্রকৃতিকে বেষ্টিত করিয়া বসিয়াছে। অন্ধকারের জ্যোতি: কি সুন্দর; নিস্তব্ধতার মুখরতা কি হৃদয়গ্রাহিনী; অনিলের অনাবিল কেলি কি মধুর; তারকার মিটিমিটি হাসি কি শান্তিদায়ক !" (ভক্তের পত্র, সংখ্যা ১১২)

প্রকৃতির সৃষ্টি-শৈলী, সৌন্দর্য্য ও নিপুনতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, বেঁধেছিল মহব্বতের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে। তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির সবকিছুতেই দয়াময়ের অকৃপণ মহব্বত। আর তাইতো প্রতিটি, ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বস্তুও স্রষ্টার স্মরণে ও ভক্তিতে ব্যাকুল তাঁর চোখ। প্রেমে পাগল হয়েছিলেন তিনি, আর প্রকৃতি তাঁর ভাবাবেগ ও ব্যাকুলতাকে করেছিল প্রবল গতিশীল, পৌঁছে দিয়েছিল প্রেমের শুদ্ধতম স্তরে অর্থাৎ আধ্যাতিকতার স্তরে যেখানে মহাপ্রভু তাঁর কাছে প্রেমিক হয়ে ধরা দিয়েছেন এবং মহব্বতের খেলায় মেতেছেন।

ইন্দ্রিয়াতীত স্তর থেকে পাওয়া তাঁর ভেতরের এ প্রেম ও আবেগ তাঁকে সারাক্ষণ তাড়িত করে বেড়িয়েছে। তিনি তার প্রিয়জনকে বলেছেন "নিভৃতে চিন্তা করিবে, মধ্য রাত্রিতে তারকা-খঁচিত আকাশের দিকে তাকাইবে এবং সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্টি-রহস্য ধ্যান করিবে। দেখিবে, এক অজানা মুহূর্ত্তে হৃদয়ের দরজা খুলিয়া গিয়াছে, চিন্তাময় হৃদয়াসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।" চিন্তা, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা কোন স্তরে পৌছলে একজন মানুষ এভাবে বলতে পারেন, ভাবতে পারেন তা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃতির মাঝে তিনি শুধু দিনাতিপাতই করেননি, লিখে গেছেন নিরলসভাবে তাঁর মনের ভাবনাগুলোকে। প্রাঞ্জল ভাষা, সাবলীল বর্ণনা, উপমা ও অলংকরণে তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে এক অনন্য সাহিত্য, যা পড়তে পড়তে কখনো মনে হয়েছে এ যেন এক পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী, কখনো মনে হয়েছে যে অর্থ আমরা বুঝিনা তারই এক সোজা-সরল রূপকে যেন মেলে ধরেছে আমাদের ঠুলি পড়া চোখের সামনে।

তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে নানা ঘটনার বর্ণনা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ এবং এসব দেখে তাঁর নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ, যা একজন পাঠককে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে অসীমের প্রতি আকৃষ্ট করে, স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালবাসতে মনকে উতলা করে, উপলব্ধির দরজা খুলে দেয়। তাঁর লেখা পড়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানা ছবি। ঝড়ের তাণ্ডব, সমুদ্রের গভীরতা, পাহাড়ের উচ্চতা, ভোরের স্নিগ্ধতা, রাতের নিস্তব্ধতা, জোছনার নির্মল আলো, সবুজ বনানী, গাছের ছায়া, পাখির কূজন, গোধূলীর অপার সৌন্দর্য্য বর্ননা পাঠক মনকে মোহিত করে রাখে এবং এভাবে একজন পাঠককে ভক্ততে পরিণত করা, ধরে রাখা, ভাবিত করা, আবেগাপ্লুত করা এটা একজন লেখকের অনেক বড় পান্ডিত্ব বা যোগ্যতা, যা তাঁর ছিল।

যে নদী, যে পাহাড়, বা সমুদ্র, বা অরণ্য তাঁকে দু-দণ্ড স্বস্তি দিয়েছে বা কোনো ঘটনার স্বাক্ষী হয়ে আছে সে স্থানকে তিনি কখনো ভুলেননি। বরং তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে সেসকল জায়গার স্মৃতিময় বর্ণনায় তাঁর মহব্বত ও নির্মল মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে নানা ঢঙে। প্রকৃতি তাই তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে এবং তাঁর হৃদয়-উৎসারিত স্মৃতিচারণ সেই জায়গাগুলোকে অধিকতর মনোহর করে তুলেছেন। তাঁর রচিত 'আমার জীবনধারা' গ্রন্থে সমুদ্রপথের স্মৃতি অধ্যায়ে দেখা যায় যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হলো, জাহাজের যে কক্ষে তিনি ছিলেন সে কক্ষটি পানিতে ভেসে গেল- এমন সময়েও তিনি সৃষ্টি এবং স্রষ্টার লীলায় বিভোর হয়েছেন, ভাবের আবেগে হয়েছেন উদ্বেল এবং সেই অবস্থায়ও তিনি লিখে গেছেন সে সময়কার তাঁর ভাব ও ভাবনাকে, তারপর স্থির হতে পেরেছেন ।

একই গ্রন্থের টেকনাফের স্মৃতি অধ্যায়ে দেখা যায় পার্থিব কোলাহল তাঁকে যখন অস্থির করতো তখন তিনি একাকী নিকটবর্তী জঙ্গলে একটি বিশেষ বৃক্ষতলে বসে চিন্তা-মগ্ন হয়ে পড়তেন, অবশেষে সঙ্গি সাথীরা তাকে খুঁজে খুঁজে বের করতেন। পরবর্তীতে তিনি সেই প্রিয় (বিশেষ) বৃক্ষটিরও খবর নিয়েছেন। জানা যায় বৃক্ষটি কিছুকাল মধ্যেই শুকিয়ে মারা গিয়েছিল। অতিব দরদের সাথে তিনি এসব ঘটনার বর্ণনা করেছেন এবং আর্দ্র করেছেন ভক্তকুলের শুষ্ক হৃদয়কে। তিনি বলেছেন, "প্রেমের প্রভাব কেবল মানব হৃদয়কে আক্রমণ করে তাহা নহে, প্রত্যেক সজীব পদার্থ ইহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। প্রেমের দহন বড় উগ্র, মানব হৃদয় ভেদ করিয়া পারিপার্শ্বিক বস্তুকেও দহন করে"।

তাঁর ধূমের স্মৃতি অধ্যায় পড়ে জানা যায়, প্রকৃতি কিভাবে তাঁকে দিত আবেগ ও ভাবের বিহ্বলতা। প্রকৃতির পরশে তিনি হারিয়ে যেতেন সূরের মূর্ছণায়, সঙ্গীতের স্রোতধারায়। হিংস্র বাঘের ভয়ে যে পাহাড়ের নিকটবর্তী জঙ্গলে কেউ যেতোনা, সেখানে তিনি সন্ধ্যার নামাজ পড়েছেন, দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছেন। জোৎস্না মাখা মধ্য রাতে পাহাড়স্থ বন আলোকিত হলে, সেখানে তিনি ছামা সঙ্গীত করেছেন, ভেসে গেছেন ভক্তি সঙ্গীতের সূরের মূর্ছনায়। নির্মলতা ও প্রকৃতির প্রশান্তি তাঁকে আষ্টে পৃষ্ট্রে বেঁধেছিল প্রেমের রজ্জুতে। পার্থিব জীবনের হানাহানি, স্বার্থপরতা, নিচুতা, অশান্তি ও অমঙ্গল যখন ঘনঘোর হয়ে আসে তখন প্রকৃতির কাছে গেলে সে দিতে পারে প্রেম, শান্তি ও ধৈর্যের শিক্ষা।

প্রেমের শিক্ষা, গভীরতা ও নিমগ্নতা দিয়ে মুর্শিদকে ধরতে হলে, তাঁকে খুঁজে পেতে হলে হৃদয়ের নির্মলতা প্রয়োজন, প্রয়োজন কলুশতা থেকে বেড়িয়ে আসা। স্রষ্টার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে হলে গভীর প্রেমে নিমজ্জন করতে হয়। কোলাহল, পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার চক্র থেকে বের না হতে পারলে সেই চরম, গভীরতম এবং শুদ্ধতম উপলব্ধি, ভাববেগ ও মহব্বত তৈরী হয়না। প্রকৃতির নির্মলতা এই মহব্বত তৈরীতে খোরাক জোগায়, প্রকৃত প্রেমিককে এগিয়ে নিয়ে যায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ডুবিয়ে দেয় ভাবের অতলে। আত্মা তখন মনিমানিক্য কুড়িয়ে নিয়ে আসে উপলব্ধির গভীরতম স্তর থেকে, ভিতরটা তখন স্বচ্ছ হিরক খন্ডের মত জ্বল জ্বল করে, ঠিকরে আলো ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, সে আলো আবার তারাই দেখে যার হৃদয়ে মহব্বতের রোশনাই আছে ।

সে রোশনাই ছিল খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) হৃদয়ে। তাই তিনি প্রেমিক আহছানউল্লা এবং তাঁকে প্রেমিক বানাতে সৃষ্টি জগতের অপার রহস্য ও সৌন্দর্য্য নিবিড় ভূমিকা রেখেছে। দেখা যায় কখনো মনের কালিমা ও গ্লানি দূর করতে, কখনো মনের মধ্যে জমাট হওয়া দীনতা-হীনতার মেঘ, কষ্টের মেঘ, ভয়ের মেঘ দূর করতে তিনি ছুটে গেছেন পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল,নদীস্রোত অর্থাৎ প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতিও প্রিয় সঙ্গি হয়ে, বন্ধু হয়ে তাঁকে ঘিরে রেখেছে সমস্ত জীবন ব্যাপী, দিয়েছে তাঁর দীর্ঘ জীবনের দুকুল ছাপিয়ে।

তাই আমার জীবনধারা গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "যখন ক্ষুদ্র ঘাসফুলের মধ্যে অচিন্ত্য শিল্পের পরিচয় পাই, যখন গোলাপের সুগন্ধ মনকে ভরপুর করে, যখন *পাতাবাহার দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে, যখন পাখীর কুজন কর্ণকুহরকে তৃপ্ত করে, যখন প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য হিল্লোল* শরীরকে শীতল করে, তখন চকিতে দয়াময়ের অফুরন্ত দয়ার কথা মনে পড়ে। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল আত্মাকে মুগ্ধ করে, বুক ধড়ফড় করিতে থাকে, আর প্রেমময়ের সান্নিধ্য কলবকে তোলপাড় করিতে থাকে ।"

তাই তাঁর প্রেম তাকে বারংবার নিয়ে গেছে প্রকৃতির কাছে। একই গ্রন্থে তিনি আরও বলেছেন "প্রেমিকের জন্য, পর্ব্বত, অরণ্য ও সমুদ্র অতি উপাদেয়। এই জন্যই সাধু পুরুষেরা সংসার ভুলিয়া উত্তুঙ্গ পর্ব্বতচূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।" তাই বলে তিনি বাস্তব জীবনের কর্তব্য কর্মপালনে কোন অবহেলাও বরদাশত্ করেননি। এ উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি সংসারকে ভুলতে বলেননি, বরং সংসারের নানা কালিমা বর্জন করতে বলেছিলেন। তাঁর লেখায় তিনি প্রায়শই নানাস্থানের স্মৃতির উল্লেখ করেছেন খুব দরদের সাথে। তাঁর এই স্মৃতিকাতরতা এবং আবেগমাখা প্রকাশ তাঁর প্রেমিক রূপটিকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

ভক্তের পত্র, পত্রসংখ্যা ৮৮ তে দেখা যায় এক নির্জন দ্বীপে একাকী অবস্থানকালে প্রকৃতির প্রেমে তাঁর একাত্মতার প্রকাশ। সেসময় তিনি লিখেছেন "এখানকার সমস্ত জড়বস্তু অনুকুল হইয়া মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে সমুৎসুখ। অনন্তের মহিমা অনন্ত সমুদ্রপটে প্রকটিত। এখানকার নীল নভঃ সদা হৃষ্টচিত্ত, এখানকার নক্ষত্রমণ্ডল আনন্দে বিভোর। এখানকার চন্দ্রিমা বড়ই গর্ব্বিত। এখানকার দিবাকর সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বর্ণথালে স্বর্ণপুষ্প লইয়া প্রিয়তমের সঙ্গলাভ করিতে ছুটিয়া যায়। এখানকার সুশীতল বায়ু একমনে, একতানে দিবারাত্র ব্যঞ্জন করে।"

তাঁর প্রেমিক মনের এমন আকুতি কোনো এক পূর্ণিমা রাত্রে, সমুদ্রতীরে বসে লেখা ৮৭ নং পত্রে আরও জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে প্রেমের জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে তিনি বলছেন, আমি মহাসমুদ্রের মহালীলা দেখিবার জন্য উদগ্রীব। তাই জেলার প্রান্ত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া মুক্ত স্থানের মুক্ত বায়ু সেবন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। যদি সেই পুন্যস্রোতে জীবন স্রোত ভাসাইয়া দিতে পারি, যদি সেই মহাপ্রভূর অনন্ত স্রোতে আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারি, তবে এ-জীবন স্বার্থক মনে করিব।" প্রকৃতির সৌন্দর্য পিপাসু একজন মানুষই, একজন সাধকই কেবল বলতে পারেন এমন বিশ্বাসের কথা।

আমাদের প্রাণপুরুষ, দিকনির্দেশক, মিশন প্রতিষ্ঠাতা যেভাবে ধারণ করেছিলেন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মহত্ব, প্রকৃতি ও সুন্দরের প্রতি প্রেম, আমরাও সেভাবে ভালোবাসবো প্রকৃতিকে, স্রষ্টার সকল সৃষ্টিকে। তাঁর জীবন ও প্রকৃতি প্রেম অধ্যয়ন করে এতটুকু বলা যায়, ধরণীকে বসুধায় পরিণত করার ভাবনা কেবল তিনিই ভাবতে পারেন যার চিত্ত নির্মল ও নিস্পাপ এবং নিসর্গ প্রেমে ও ভক্তির আলোয় সমুজ্জ্বল।

তথ্যসূত্রঃ

১. আমার জীবনধারা
২. ভক্তের পত্র
৩. সৃষ্টিতত্ত্ব,
৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এক জ্যোতির্ময় মনীষী,
আ.শ.ম. বাবর আলী কৃত গ্রন্থ